তিমিরগুহার গুপ্তধন

পরিমল পাত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

রাম ও শ্যামকে নিয়ে প্রথম যে গল্পটা আমার ছোট্ট ছেলে শ্রীমান নীলাদ্রিকে বলেছিলাম সেটা ছিল রোমহর্ষক ভৌতিক গল্প। গল্পটা ভালো লাগায় বারবারই রাম-শ্যামের অনুরূপ গল্পের অনুরোধ আসতে লাগল। অগত্যা রাম-শ্যামকে নিয়ে ভৌতিক, রোমহর্ষক, রহস্যময় বহু গল্পই বলি। তারই একটি হল "তিমিরগুহার গুপ্তধন"। তিমিরগুহার গুপ্তধন লেখা শুরু করি ১৯৯৬ সালে। তারপর নানান কাজের চাপে তা আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি। প্রায় দশ বছর পর লেখাটা সমাপ্ত করি।

পুনশ্চ-র কর্ণধার শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়ক শোনামাত্র তিমিরগুহার গুপ্তধন প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আমায় চিন্তামুক্ত করেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পুনশ্চ-র কর্মীবৃন্দের কাছে যাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় তিমিরগুহার গুপ্তধন-এর সন্ধান বাংলার কিশোর-কিশোরীদের হাতে পৌঁছোল। বইটি তাদের ভালো লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

পরিমাল পাত্র
রাজডাঙা
কলকাতা

কলকাতা বইমেলা, ২০০৮

॥ ১ ॥

মেসে ঢুকতেই রামসিং খবর দিল যে বড়োবাড়ির বড়োবাবু তাদের খোঁজ করেছেন। কথাটা শুনেই থমকে দাঁড়াল রাম। তার সঙ্গে শ্যামও। বড়োবাড়ির বড়োবাবু মানে তাদের মেসের পুবদিকে বড়োরাস্তার ওপারের সেই পুরোনো বাড়িটার বড়োবাবু হারাধন রায়।

রাম জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলেছে নাকি?

রামসিং খইনি ডলতে ডলতে উত্তর দিল, তোমাদের দুজনকে বড়োবাবু যেতে বলেছেন।

হারাধনবাবু যে তাদের ডাকতে পারেন তা ওদের ধারণার বাইরে। প্রায় তিনবছর হল ওরা এই মেসে আছে। কোনোদিন হারানবাবু তাদের সঙ্গে কথাও বলেননি। প্রায়ই কলেজ যাবার সময় তাঁকে বড়োবাড়ির সামনে দেখা যায়। সঙ্গে থাকে কুচকুচে কালো একটা স্পিৎজ। আলাপ ওই পর্যন্তই।

কেন ডেকেছেন তা জানার জন্য রাম ও শ্যাম দুজনেই আগ্রহী হয়ে উঠল। যাই হোক, ওরা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

কলকাতায় মেসে থেকে রাম ও শ্যাম পড়াশোনা করে। মেসটা অনেকদিনের পুরোনো। সাবেক আমলের বাড়ি। এখানে থেকেই শ্যামের বাবা পড়াশোনা করেছেন। দোতলার কোণের ঘরটিতে দুটি সিংগল বেডে রাম ও শ্যাম থাকে। ঘরটি ওদেরই হয়ে গেছে। পাশাপাশি ঘরগুলিতে বিভিন্ন পেশার লোক থাকেন। বেশিরভাগই বড়োবাজারের কাপড়ের দোকানের কর্মী। আবার সরকারি বা ব্যাংক কর্মচারীও আছেন। এমনই বারো-চোদ্দোজন নিয়ে তাদের মেস। নীচের ঘরগুলির মধ্যে রান্নাঘর খাবারঘর ছাড়াও গেটের পাশেই সিঁড়ির কাছে আছে আরও একটা ছোটো ঘর। এটাই রামসিং-এর ঘর। সে-ই-বাড়ির দারোয়ান, পাহারাদার বা কেয়ারটেকার। শ্যাম মামার ছেলে, রাম পিসির। দুজনের জন্মদিনও একই। শ্যামের বাবা ফরেস্ট অফিসার। বদলির চাকরি। তাই পড়াশোনার অসুবিধা হওয়ায় শ্যামকে কাছে রাখতে পারেননি। ছোটোবেলা থেকেই শ্যাম পিসির বাড়িতে। বেশিরভাগ সময়টাই তার কাটে রামের সঙ্গে। পড়াশোনা, খেলাধুলো, গল্পগুজব, বেড়ানো সবই একসঙ্গে।

মেসের পুব দিকের বড়োবাড়ির সামনে শ্বেতপাথরে লেখা "রায়বাড়ি" তারা দেখেছে। বাড়িটাকে সবাই— বিশেষকরে মেসের লোকেরা 'বড়োবাড়ি'ই বলে। বড়ো অবশ্য উঁচুতে নয়, বড়ো আয়তনে। কমপক্ষে একএকর জমি নিয়ে এই বড়োবাড়ি।

বাড়ির মধ্যেই আছে একটা পুকুর। তার ঘাট শান-বাঁধানো। আর আছে নানা ধরনের গাছপালা। বাইরে থেকে গাছপালা দেখা গেলেও পুকুর দেখা যায় না। লোকের মুখে শোনা।

বাড়িতে লোকজন বিশেষ কেউ থাকে না। বাড়ির বর্তমান মালিক হারাধন রায় কয়েকজন ঝি-চাকর নিয়ে থাকেন। রায়বংশের আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ এখানে আসে না। রায়দের পৈতৃক বাড়িতেই সেসব পাট চলে। তবে মাঝে মধ্যে কেউ যে না আসে তা নয়। বিশেষ কাজে কেউ এলেও কাজ মিটিয়েই চলে যায়।

বাড়িটা ভুতুড়ে বলেও কখনো-সখনো মনে হয়েছে রাম-শ্যামের। বাড়িটা নিয়ে আর তার বাসিন্দা হারাধন রায়কে নিয়ে তাদের কৌতূহলও ছিল যথেষ্ট।

ওপরে নিজেদের ঘরে গিয়ে জামাপ্যান্ট বদলে নিল তারা। আজই তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হারাধন রায় বোধহয় সে খবর রাখেন। তাই আজই ডেকে পাঠিয়েছেন।

শ্যাম নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল, বড়োবাড়িতে যাবি তো? কখন?

রাম বলল, এখনই চল, দেরি করে লাভ কী? দেখাই যাক না ব্যাপারটা।

বড়োবাড়ির দারোয়ান যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। দরজার সামনে আসতেই হাসি-হাসি মুখ করে বলল, আসুন, আমার সাথে চলুন।

তিনতলার দক্ষিণদিকের একটা ঘরে ওদের নিয়ে গেল সে। বড়োবাবু ঘরের মধ্যেই ছিলেন। বললেন, এসো, বোসো এখানে।

ঘরটা বেশ বড়ো। দক্ষিণ দিকে দুটো বড়ো বড়ো জানালা। তার সামনে সোফা পাতা আছে। রাম-শ্যাম সোফায় পাশাপাশি বসল। সামনে হারাধনবাবু। মাঝে নীচু একটা গোল টেবিলে নানা ধরনের কিছু ম্যাগাজিন — ইংরেজি, বাংলা, হিন্দিও আছে।

হাতের খবরের-কাগজখানা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে হারাধনবাবু বললেন, তোমাদের পরীক্ষা তো আজই শেষ হল। তাই না? কেমন হল?

হারাধনবাবুর কথাগুলো কেমন নিজের লোকের মতো মনে হল। প্রথম প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে রাম বলল, ভালোই করেছি।

হাসিমুখে হারাধনবাবু বললেন, অনেকদিন থেকেই ভাবছি তোমাদের সাথে আলাপ করব। আমার সময় হলেও তোমাদের তো সময়ই হয় না। নানা কাজে ব্যস্ত তোমরা। তার মাঝেই পরীক্ষার পড়া। আচ্ছা, এখন তো হাতে অঢেল সময়। কী করবে? স্টোনম্যানের রহস্য-সন্ধানে নামবে নাকি?

রাম লজ্জা পেল। ভদ্রলোক তার সখের গোয়েন্দাগিরিরও খবর রাখেন! আমতা-আমতা করে বলল, না — তা নয়। ওই, মাঝে মাঝে সময় পেলে একটু মাথা ঘামাই। ও তেমন কিছু নয়। তা ছাড়া স্টোনম্যান তো সহজে ধরা পড়বে বলে মনে হয় না।

— এমন কথা বলছ কেন?

এবার শ্যাম মুখ খোলে। পুলিশই হদিস পেল না, আমরা তো কোন ছার!

— তাছাড়া কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরিয়ে পড়তে পারে। রাম মন্তব্য করল।

আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ করেছে। মাঝে মাঝেই মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে। এই সময় একজন বেয়ারা কফি আর নোনতা বিস্কুট দিয়ে গেল। ওরা তিনজনে খাওয়া শুরু করল।

কফি খেতে খেতে হারাধনবাবু বললেন, তোমাদের গ্রামের নবীন মুখুজ্জেকে চেনো নিশ্চয়ই।

— হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি। ওনাকে আমরা দাদু বলতাম। ভালো শিকারি ছিলেন। কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন কীভাবে? রাম কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

— ওই শিকারি হওয়ার জন্যেই। মৃদু হাসিমুখে হারাধনবাবু বললেন।

— আপনিও শিকারি নাকি? শ্যাম আগ্রহে চোখ বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করে।

— শখের শিকারি বলতে পার। তবে শিকার করা আমাদের পেশা নয়। বলেই রামবাবু জোরে হেসে উঠলেন।

একটু পরে আবার বলতে শুরু করলেন।

— রহস্য সন্ধানে যখন তোমরা উৎসাহী তবে তোমাদের সাহস ও বুদ্ধি আছে মানতে হয়। তোমাদের কয়েকটা সাফল্যের কথাও শুনেছি।

রাম প্রশ্ন না করে পারে না — কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে এতসব জানলেন কোথা থেকে? আর কেনই বা জানার দরকার বোধ করলেন?

মৃদু হেসে হারাধনবাবু বললেন, তোমাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানি।

আমার নিজের দরকারেই জেনেছি। তার কারণ তোমাদের দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেবার তালে আছি।

এবার বোঝা গেল রায়বাড়ির বড়োবাবু কেন তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আসলে স্বার্থ ছাড়া কেউই বুঝি কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না।

— কী কাজ বলুন। পারলে নিশ্চয়ই করব। বিজ্ঞের মতো গম্ভীর মুখে রাম বলল।

— পারবে কি না জানি না। তবে তোমাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে বুঝেছি যে কাজটা নিশ্চয়ই তোমরা নেবে, ভয়ে পিছিয়ে আসবে না।

কথা বলতে বলতে উঠে সামনের আলমারি থেকে একটা মোটা খাতা বের করলেন হারাধনবাবু। অনেকদিনের পুরোনো খাতা। কালো কালিতে খেরোর খাতাটায় কীসব লেখা আছে। খাতাটা টেবিলে রেখে হারাধনবাবু বললেন, কাজ হাতে নেবার আগে কাজের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। না কী, বলো!

রাম বলল, তা জানা দরকার বই-কি।

হারাধনবাবু সোফায় মুখোমুখি বসে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললেন, এখন থেকে যা বলব তা কেবল তোমরা দুজনই জানবে। তৃতীয় আর কেউ জানবে না। তোমরা নিজেরা আলোচনা করার সময়ও যেন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তা টের না পায়।

একটু থেমে মনে মনে বক্তব্যটা একটু গুছিয়ে নিলেন হারাধনবাবু। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, একটা গুপ্তধনের সন্ধান জানি। সেটা উদ্ধার করতে যেতে হবে।

রাম আর শ্যাম দুজনেই একসঙ্গে বলে, গুপ্তধন! কোথায়?

— ঠিক সেটাই আমার প্রশ্ন — কোথায়? কিছু সংকেত আছে, তা দেখে খুঁজে বের করতে হবে জায়গাটা কোথায়।

— কিন্তু গুপ্তধন যে আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন কীভাবে? রাম প্রশ্ন করে।

টেবিলে রাখা খাতাটা দেখিয়ে হারাধনবাবু বলেন, ওখানেই সন্ধান পেয়েছি। আমাদেরই পূর্বপুরুষ গুপ্তধন রেখে গেছেন।

এরপর হারাধনবাবুর মুখে যে ইতিহাস তারা শুনল তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কখন যে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল, কখন থেমেছিল তা কারও খেয়াল ছিল না।

রাত্রি এগারোটায় একহাঁটু জল পার করে যখন তারা মেসে ফিরল তখন রামসিং প্রশ্ন করল, এত দেরি হল বাবু?

রাম বা শ্যাম কেউই কোনো জবাব দিল না। ওপরের ঘরে চলে গেল।

॥ ২ ॥

গঙ্গা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এই বিস্তীর্ণ এলাকা শ্বাসমূলযুক্ত সুন্দরি, গরান প্রভৃতি গাছের ঘন জঙ্গলে

ঢাকা। এটাই হল সুন্দরবন। দিনেরাতে দুবার সমুদ্রে জোয়ার আসে। নদী বেয়ে জল ঢুকে পড়ে সুন্দরবনের বাদাবনের জঙ্গলে। বাদাবন জলে থই-থই করে। ভাটার সময় জল নেমে যায়। প্রতিনিয়তই এই খেলা চলে।

সুন্দরবনের মধ্যে মাঝে মাঝে লোকবসতি দেখা যায়। এরা কোথা থেকে এসেছে তা বলা শক্ত। তবে প্রতিকূল পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় বলে এরা বেশ শক্ত সমর্থ ও পটু। সমতলভূমিতে চাষবাস ও সমুদ্রে মাছ ধরা এদের প্রধান জীবিকা।

এখন থেকে প্রায় দুশো বছর আগে সুন্দরবনের কোলে এমনই একটি গ্রামে বাস করত একদল মানুষ। তাদের কেউ কেউ বনে মধু সংগ্রহ করত। কেউ কেউ চাষবাস করত। বাকিরা সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। এই জেলেদের অন্যতম হল দুলাল জেলে। সে মরশুমে দলবল নিয়ে মাছ ধরতে যেত সমুদ্রে। তার নিজের নৌকো ও জাল ছিল। দরকার পড়লে মহাজনের কাছেও ধার নিত নৌকো কিংবা জাল। কিছু চাষাবাদও সে করত। বাড়িতে গোরুও ছিল। সংসারে সচ্ছলতা ছিল। বড়ো ছেলে দুটো তার সঙ্গে মাছ ধরতে যেত। ছোটোটা দাশরথি, গোরু চরায়। সবে বারো বছরে পড়েছে। বেশ শক্ত গড়নের শরীর তার। যেন কালো পাথরে তৈরি। ক্ষমতাও তেমনি। গত মরশুমে সেও দলের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল।

জেলেদের সর্দার যেমন দুলাল, তেমনি তার ছেলে দাশুও ছিল রাখাল দলের সর্দার। রাখালরা সবাই তাকে মেনে চলত। প্রতিদিন নতুন নতুন খেলা খেলত তারা।

তাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে গঙ্গা আর দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গল। তারপরে বঙ্গোপসাগর। মাঝে গঙ্গার একটা সরু শাখানদী বয়ে গেছে গ্রামটাকে দুভাগ করে। নদী সরু, কিন্তু তীব্র স্রোতযুক্ত। পূর্বে নদীর ওপর গাছ কেটে গুঁড়ি দিয়ে একটা সাঁকো তৈরি করে নিয়েছিল গ্রামের লোকেরা। তারও পূর্বদিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানে যার নাম বাংলাদেশ।

জোয়ারের সময় বাদাবনে জল ঢুকলে মাঝে মাঝেই বাদাবনের বাঘ গ্রামে চলে আসত। বাঘ কুমির আর মশা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া গাঁ উজাড় করে দিত।

অঘ্রান মাসে চাষের মাঠে ধান কাটা তোলা হয়ে গেলে রাখালছেলেরা তাদের গোরু ছাগল মাঠে চরাতে নিয়ে যেত। অন্যসময় তারা অনাবাদি ঘাসের জমি, পতিত জমি বা কাছাকাছি জঙ্গলে গোরু চরাতে যেত। সঙ্গে থাকত তিরধনুক। এটা ছিল তাদের খেলার জিনিস। তবে নিতান্ত খেলার সামগ্রী এটা নয়। তিরের মাথায় লোহার ফলা লাগিয়ে এটা দিয়েই বনবেড়াল, খটাশ, খ্যাঁকশিয়াল বা হায়নাও শিকার করে। মাঝে